#আমি পদ্মজা পর্ব ১

ফাহিমা ক্লান্ত হয়ে ধপ করে ফ্লোরে বসে পড়ল। হাত থেকে লাঠি পড়ে গিয়ে মৃদু আওয়াজ তুলে। তার শরীর ঘেমে একাকার। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম হাতের তালু দিয়ে মুছে, বার কয়েক জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল। এরপর চোখ তুলে সামনে তাকাল। রিমান্ডে কোনো পুরুষই টিকতে পারে না,সেখানে একটি মেয়ে আজ চার দিন ধরে রিমান্ডে। তাঁর সামনে চেয়ারে বাঁধা অবস্থায় ঝিমুচ্ছে। চার দিনে একবারও মুখ দিয়ে টু শব্দটি করল না। শারিরীক, মানসিক কত নির্যাতন করা হয়েছে

তবুও ব্যথায় আর্তনাদ অবধি করেনি! মনে হচ্ছে, একটা পাথরকে পিটানো হচ্ছে। যে পাথরের রক্ত ঝড়ে কিন্তু জবান খুলে না। তখন সেখানে আগমন ঘটে ইন্সপেক্টর তুষারের। তুষারকে দেখে ফাহিমা কাতর স্বরে বলল, ‘সম্ভব না আর। কিছুতেই কথা বলছে না।’ তুষার অভিজ্ঞ চোখে মেয়েটিকে দুয়েক সেকেন্ড দেখল।এরপর গম্ভীর কণ্ঠে ফাহিমাকে বলল, ‘আপনি যান।’

ফাহিমা এলোমেলো পা ফেলে চলে যায়। তুষার একটা চেয়ার নিয়ে মেয়েটির সামনে বসল। বেশ কিছুক্ষণ

চুপ থেকে বলল, ‘আপনার সাথে আজ আমার প্রথম দেখা।’

মেয়েটি কিছু বলল না। তাকালও না। তুষা মেয়েটির দিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি মেলে তাকাল। বলল,’মা-বাবাকে মনে পড়ে?’

মেয়েটি চোখ তুলে তাকায়। ঘোলাটে চোখ। কাটা ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরছে। চোখের চারপাশ গাঢ় কালো। চোখ দু’টি লাল। মুখের এমন রং রিমান্ডে আসা সব আসামীর হয়। তুষার মুখের প্রকাশভঙ্গী আগের অবস্থানে রেখেই আবারও প্রশ্ন করল, ‘মা-বাবাকে মনে পড়ে?’

মেয়েটি মাথা নাড়ায়। মনে পড়ে তার! তুষার একটু ঝুঁকে। মেয়েটি অসহায় দৃষ্টি মেলে তাকায়। তুষার মেয়েটির হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে নির্বিকার ভঙ্গিতে প্রশ্ন ছুঁড়ল, ‘নাম কী?’

যদিও তুষার মেয়েটির নাম সহ পুরো ডিটেইলস জানে।তবুও জিজ্ঞাসা করল। তার মনে হচ্ছে,মেয়েটি কথা বলবে। সত্যি তাই হলো। মেয়েটি ভারাক্রান্ত কণ্ঠে নিজের নাম উচ্চারণ করল, ‘পদ্ম...আমি...আমি পদ্মজা।’

পদ্মজা হেলে পড়ে তুষারের উপর। তুষার দ্রুত ধরে ফেলল। উঁচু কণ্ঠে ফাহিমাকে ডাকল,’মিস ফাহিমা। দ্রুত

এদিকে আসুন।’
ফাহিমা সহ আরো দুজন দ্রুত পায়ে ছুটে আসে।

———————

১৯৮৯ সাল। সকাল সকাল রশিদ ঘটকের আগমনে হেমলতা ভীষণ বিরক্ত হোন। তিনি বার বার পইপই করে বলেছেন, ‘পদ্মর বিয়ে আমি এখুনি দেব না। পদ্মকে অনেক পড়াবো।’ তবুও রশিদউদ্দিন প্রতি সপ্তাহে, সপ্তাহে একেক পাত্রের খোঁজ নিয়ে আসবেন। মেয়ের বয়স আর কতই হলো? মাত্র ষোল। শামসুল আলমের মেয়ের বিয়ে হয়েছে চব্বিশ

বছর বয়সে। পদ্মর বিয়েও তখনি হবে। পদ্মর পছন্দমতো। হেমলতা রশিদকে দেখেও না দেখার ভান ধরলেন। রশিদ এক দলা থুথু ফেললেন উঠানে। এরপর হেমলতার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘বুঝছো পদ্মর মা,এইবার যে পাত্র আনছি,এক্কেরে খাঁটি হীরা।’
হেমলতা বিরক্তভরা কণ্ঠে জবাব দিলেন, ‘আমি আমার মেয়ের জন্য পাত্র চাইনি। তবুও বার বার কেন আসেন আপনি?’
‘যুবতী মাইয়া ঘরে রাহন ভালা না।’
‘মেয়েটা তো আমার। আমাকেই বুঝতে দেন না।’ হেমলতার কণ্ঠে বিরক্তি ঝরে পড়ছে।

রশিদ অনেক চেষ্টা করেও সুবিধা করতে পারলেন না।ব্যর্থ থমথমে মুখ নিয়ে সড়কে পা রাখেন। প্রতিদিনই কোনো না কোনো পাত্রপক্ষ এসে হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে বলবে, ‘মোর্শেদের বড় ছেড়িডারে চাই।’

রশিদ নিজে নিজে বিড়বিড় করে আওড়ান, ‘গেরামে কি আর ছেড়ি নাই? একটা ছেড়িরেই ক্যান সবার চোক্ষে পড়তে হইব? চাইলেই কি সব পাওন যায়?’

পূর্ণা স্কুল জামা পরে পদ্মজাকে ডাকল, ‘আপা? এই আপা? স্কুলে যাবি না? আপারে...”

পদ্মজা পিটপিট করে চোখ খুলে কোনোমতে বলল, ‘না।’ পর পরই চোখ বুজে ঘুমে তলিয়ে গেল। পূর্ণা নিরাশ হয়ে মায়ের রুমে আসে।

‘আম্মা,আপা কী স্কুলে যাইব না?’

হেমলতা বিছানা ঝাড়া রেখে পূর্ণার দিকে কড়াচোখে তাকান। রাগী স্বরে বললেন, ‘যাইব কি? যাবে বলবি।’

পূর্ণা মাথা নত করে ফেলল। হেমলতার কড়া আদেশ, মেয়েদের পড়াশোনা করাচ্ছি অশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার জন্য নয়। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে। পূর্ণাকে মাথা নত করতে দেখে হেমলতা তৃপ্তি পান। তার মেয়েগুলো

মান্যতা চিনে খুব। খুবই অনুগত। তিনি বিছানা ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, ‘পদ্মর শরীর ভালো না। সারারাত পেটে ব্যাথায় কাঁদছে। থাকুক,ঘুমাক।’

পূর্ণার কিশোরী মন বুঝে যায়,পদ্মজা কীসের ব্যাথায় কেঁদেছিল। সে রাতে নানাবাড়ি ছিল বলে জানতো না।ভোরেই চলে এসেছে। নানাবাড়ি হেঁটে যেতে পাঁচ মিনিট লাগে। পূর্ণাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হেমলতা বললেন, ‘তুই যা। মাথা নীচু করে যাবি মাথা নীচু করে আসবি।’

‘আচ্ছা,আম্মা।’

পূর্ণা রুমে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল। নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। এরপর গত মাসে মেলা থেকে আনা লাল লিপস্টিক গাঢ় করে ঠোঁটে মাখে। চৌদ্দ বছরের পূর্ণার ইদানীং খুব সাজতে ইচ্ছে করে। হেমলতা সেজেগুজে স্কুলে যাওয়া পছন্দ করেন না বলে, পূর্ণা আগে লিপস্টিক মাখেনি।

টিন দেয়ালের কাঠের ঘড়ির কাঁটায় সকাল দশটা বাজল মাত্র। এখনো পদ্মজা উঠল না। হেমলতা মেয়েদের রুমে ঢুকেন। পদ্মজা দু'হাত ভাঁজ করে ঘুমাচ্ছে। জানালার পর্দা ভেদ করে

আসা আলতো পেলব রোদ্দুরের স্পর্শে পদ্মজার মসৃণ, পাতলা ঠোঁট, ফর্সা ত্বক চিকচিক করছে। হেমলতা বিসমিল্লাহ বলে,তিনবার ফুঁ দেন মেয়ের শরীরে। গুরুজনরা বলেন, মায়ের নজর লাগে বেশি। নজর কাটাতে বিসমিল্লাহ বলে ফুঁ দিতে হয়। হেমলতার মায়া লাগছে পদ্মজার ঘুম ভাঙ্গাতে। তবুও আদুরে গলায় ডাকলেন, ‘পদ্ম। এই পদ্ম...’

পদ্মজা চোখ খুলে মাকে দেখে দ্রুত উঠে বসে। যেদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয় সেদিনই হেমলতা ডেকে তুলেন। পদ্মজা অপরাধী কণ্ঠে প্রশ্ন

করল, ‘বেশি দেরি হয়ে গেছে আম্মা?’
‘সমস্যা নেই। মুখ ধুয়ে খেতে আয়।’
পদ্মজা দ্রুত কলপাড়ে গিয়ে ব্রাশ করে,মুখ ধৌত করে। হেমলতা শিক্ষকের মেয়ে। তাই তাঁর মধ্যে নিয়ম-নীতির প্রভাব বেশি। মেয়েদের শক্তপোক্ত নিয়মে রেখে বড় করছেন। পদ্মজা রান্নাঘরে ঢুকে দেখল প্লেটে খাবার সাজানো। সে মৃদু হেসে প্লেট নিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল। তখন হেমলতা আসেন। পদ্ম দ্রুত ওড়না দিয়ে মাথা ঢাকে। হেমলতার দেওয়া আরেকটা নিয়ম, খাওয়ার সময় মাথা ঢেকে খেতে হবে। পদ্মজা নিশ্চুপ

থেকে শান্তভঙ্গিতে
খেতে থাকল । হেমলতা মেয়েকে
সহজ কণ্ঠে বললেন, ‘তাড়াহুড়ো
করছিস কেন? মুখ ধুতে গিয়ে চুল
ভিজিয়ে এসেছিস।খেয়ে রোদে বসে
চুলটা শুকিয়ে নিবি ।’
‘আচ্ছা,আম্মা।’
‘আম্মা, পূর্ণা, প্রেমা আসে নাই?’
‘পূর্ণা আসছে। স্কুলে গেছে। প্রেমা
দুপুরে আসব।’
‘আম্মা,আব্বা কবে আসবেন?’
পদ্মজার প্রশ্নে হেমলতা দাঁড়িয়ে
পড়লেন। শুকনো গলায় জবাব দেন,

‘জানি না। খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই।’

হেমলতা চলে যেতেই পদ্মজার চোখ থেকে টুপ করে এক ফোঁটা জল পড়ে পাতে। পদ্মজা দ্রুত হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে। পদ্মজার জীবনে জন্মদাতা আছে ঠিকই। কিন্তু জন্মদাতার আদর নেই। সে জানে না তাঁর দোষটা কী? কেন নিজের বাবা বাকি বোনদের আদর করলেও তাকে করে না? কথা অবধিও বলেন না। দুইবার মাকে জিজ্ঞাসা করেছে সে, ‘আমি কী তোমাদের সত্যিকারের মেয়ে আম্মা? সন্তান হয় না বলে কি দত্তক

এনেছিলে? আব্বা কেনো আমাকে এতো অবহেলা করেন? ও আম্মা বলো না?’

হেমলতা তখন নিশ্চুপ থাকেন। অনেকক্ষণ পর বলেন, ‘তুই আমার গর্ভের সন্তান। আর তোর বাবারই মেয়ে। এখন যা,পড়তে বস। অনেক পড়তে হবে তোর।’

ব্যস এইটুকুই! এর বেশি কিছু বলেন না হেমলতা। পদ্মজার কেন জানি মনে হয়,একদিন হেমলতা নিজ থেকে খুব গোপন কোনো কথা বলবেন। তবে সেটা যেন সহ্য করার মতো হয়। এই দোয়াই সারাক্ষণ করে সে।

‘এতো কী ভাবছিস? তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠ।’

হেমলতার কথায় পদ্মজার ভাবনার সুতো ছিড়ল। দ্রুত খেয়ে উঠে। আজ আমের আচার বানানোর কথা ছিল।

_____

সন্ধ্যা কাটতেই বিদ্যুৎ চলে গেল। কয়েক মাস হলো গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। আট গ্রাম মিলিয়ে অলন্দপুর। তাঁদের গ্রামের নাম আটপাড়া। প্রতিদিন নিয়ম করে সন্ধ্যারাত থেকে তিন ঘন্টা গ্রাম অন্ধকারে তলিয়ে থাকে। আর সারাদিন তো বিদ্যুৎ-এর নামগন্ধও থাকে না। বিদ্যুৎ দিয়ে

লাভটা কী হলো? পদ্মজা,পূর্ণা,প্রেমা তিন বোন একসাথে পড়তে বসেছিল। বাড়ি অন্ধকার হতেই নয় বছরের প্রেমা খামচে ধরে পদ্মজার ওড়না। পদ্মজা মৃদু স্বরে ডাকল,
‘ আম্মা? আম্মা...”
‘ আয়,টর্চ নিয়ে যা।’

হেমলতার আহ্বানে পদ্মজা উঠে দাঁড়াল। প্রেমা অন্ধকার খুব ভয় পায়। পদ্মজার ওড়না ছেড়ে পূর্ণার হাত চেপে ধরে। টর্চ নিয়ে রুমে ঢোকার মুহূর্তে পদ্মজা গেইট খোলার আওয়াজ পেল। উঁকি দিয়ে হানিফকে দেখে সে দ্রুত

রুমে ঢুকে পড়ল। হানিফ পদ্মজার সৎ মামা।

‘ বুবু...বাড়ি আন্ধার ক্যান!বাত্তি-টাত্তি জ্বালাও।’ হানিফের কণ্ঠ।
‘ হানিফ আসছিস?’হেমলতা রুম থেকে বেরিয়ে বলেন। হাতে হারিকেন। হানিফ সবকটি দাঁত বের করে হাসল। বলল, ‘হ,আমি।’
‘আয়,ভেতরে আয়।’
হানিফ বারান্দা পেরিয়ে বড় ঘরে ঢুকে বলল, ‘তোমার ছেড়িগুলান কই তে?’
‘আছে রুমেই। পড়ছে।’
‘এই আন্ধারেও পড়ে!’

হেমলতা কিছু বললেন না। হানিফ এই বাড়িতে আসলে কেন জানি খুব অস্বস্তি হয়। অকারণেই!

‘ওদের খাওয়ার সময় হয়েছে। তুইও খেয়ে নে?’
‘এইহানেই খামু? না তোমার সরাইখানাত যাইতে হইবো?’

কথাটায় রসিকতা ছিল। গ্রামে থেকেও হেমলতা খাওয়ার জন্য আলাদা রুম নির্বাচন করেছেন সেটা হানিফের কাছে রসিকতাই বটে! হেমলতা প্রশ্নের জবাব সোজাসাপটা না দিয়ে বললেন, ‘খেতে চাইলে খেতে আয়।’

পদ্মজা কিছুতেই খেতে আসল না। কেমন জড়োসড়ো হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, হানিফকে ভয় পাচ্ছে বা অবহেলা করছে। হানিফ ছয় বছর সৌদিতে ছিল। তিন মাস হলো দেশে ফিরেছে। তিন মাসে যতবার হানিফ এই বাড়িতে পা রেখেছে ততবারই পদ্মজা অজুহাত দিয়ে দূরে দূরে থেকেছে। হেমলতার বিচক্ষণ মস্তিষ্ক মুহূর্তে ভেবে নিল অনেক কিছু। তাই জোর করলেন না। আজই এই লুকোচুরির ফয়সালা হবে। হানিফ পদ্মজাকে দেখার জন্য অনেক ছলচাতুরী করল। কিছুতেই সুযোগ পেল না। বিদ্যুৎ আসার ঘন্টাখানেক

পর হানিফ চলে যায়। পূর্ণা, প্রেমা রুমে ঢুকতেই পদ্মজা ঝাঁপিয়ে পড়ে।
রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠে বলল, ‘কতবার না করেছি? লোকটার পাশে বেশিক্ষণ না থাকতে? তোরা কেনো শুনিস না আমার কথা?’

পূর্ণা ও প্রেমা বিস্ময়ে হতবিহ্বল। পদ্মজা কখনো তাদের এমন নিষেধ দেয়নি। তাহলে এখন কেন এমন বলছে?হেমলতা রুমে ঢুকতেই পদ্মজা চুপসে গেল।
‘পদ্ম আমার রুমে আয়।’

মায়ের এমন কঠিন কণ্ঠ শুনে পদ্মজার কলিজা শুকিয়ে আসে। হেমলতা নিজের ঘরে চলে যান।

হেমলতা মেয়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। পদ্মজা নতজানু হয়ে কাঁপছে। সুন্দরীরা ভীতু আর বোকা হয় তার দৃষ্টান্ত প্রমাণ পদ্মজা। হেমলতার খুব মায়া হয় পদ্মজার সাথে উঁচুকণ্ঠে কথা বলতে। পদ্মজা রূপসী বলেই হয়তো! গোপনে আবেগ লুকিয়ে তিনি বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কী লুকোচ্ছিস? হানিফের সামনে কেন যেতে চাস না? সে কী করেছে? '

পদ্মজা ফোঁপাতে থাকে। হেমলতা সেকেন্ড কয়েক সময় নিয়ে নিজেকে সামলান। কণ্ঠ নরম করে বললেন, ‘হানিফ ধড়িবাজ লোক! সৎ ভাই বলে বলছি না। আমি জানি। তাঁর ব্যাপারে যেকোনো কথা আমার বিশ্বাস হবে। তুই বল কী লুকোচ্ছিস?’

মায়ের আদুরে কণ্ঠে পদ্মজা আচমকা বাঁধ ভাঙ্গা নদীর মতো হু হু করে কেঁদে উঠল।

চলবে....